بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 20

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 21 শে জুলাই, 2016 21 ওফা,1395 হিজরী শামসী 15 শওয়াল 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কুরআন শরীফ গভীর মনোনিবেশের সহিত দেখিয়াছি, মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি, বার বার দেখিয়াছি এবং ইহার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি যে, কুরআন শরীফে যে পরিমাণে খোদার গুনাবলী ও কার্যাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ইহাতে সকল গুণের আধারের নাম আল্লাহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

অবশেষে আমি ইহাও প্রকাশ করিতে চাহি যে, যে বিষয়টি আব্দুল হাকিম খানের পথ-ভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে এবং যাহার দরুন তাহার এই ধারণা হইয়াছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই, তাহা কোরআন শরীফের একটি আয়াত ভুল বোঝার দরুন হইয়াছে। ইহা তাহার অল্প বিদ্যা ও কম চিন্তা শক্তির দরুন হইয়াছে। ঐ আয়াতটি এই

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

(সুরা বাকারা আয়াত-৬৩) অনুবাদ: অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং যে সকল লোক ইহুদী, খৃষ্টান ও নক্ষত্র পুজারী , তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিবে খোদা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে না এবং এইরূপ লোকদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় এবং চিন্তা থাকিবে না।*

নির্বুদ্ধিতা ও বক্র ধারণার দরুন এই আয়াতের অর্থ করা হইয়াছে যে, আঁ হযরত (সা.) উপর ঈমান আনার প্রয়োজন নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সকল লোক নিজেদের 'নফসে আম্মারার' (অবাধ্য আত্মার) দাস হইয়া কোরআনের সন্দেহাতীত ও সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধীতা করে এবং ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য সন্দেহব্যঞ্জক আয়াতের আশ্রয় খোঁজে। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই সকল আয়াত তাহাদের কোন কাজে আসিতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'লার উপর ঈমান আনা এবং পরকালের উপর ঈমান আনা এই বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে যে, কুরআন শরীফ ও আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, খোদা তা'লা কুরআন শরীফে 'আল্লাহ' নামের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু, অযাচিত- অসীম দাতা এবং দয়ালু, যিনি পৃথিবী ও আকাশকে ছয়টি সময়কালে বানাইয়াছেন, আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রসুলগণেকে প্রেরণ করিয়াছেন, কেতাবসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সর্বশেষে হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সা.)কে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি খাতামুল আম্বিয়া ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল । কুরআন শরীফ অনুযায়ী শেষ দিবসে মৃতরা জীবিত হইয়া উঠিবে এবং একটি দলকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে, যাহা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পুরস্কারের স্থান এবং একটি দলকে দোযকে প্রবেশ করানো হইবে, যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক শাস্তির স্থান। খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, এই শেষ দিবসে ঐ সকল লোকেরাই ঈমান আনে যাহারা এই কেতাবে ঈমান আনে।

অতএব যে -স্থলে আল্লাহ তা'লা নিজেই 'আল্লাহ' শব্দের ও 'শেষ দিবসের' ব্যখ্যাসহ অর্থ করিয়া দিয়াছেন, যাহা ইসলামের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে-স্থলে যে-ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিবে তাহার জন্য কোরআন শরীফ ও আঁ হযরত (সা.) -এর উপর ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য হইবে। এই অর্থের পরিবর্তন ঘটানোর অধিকার কাহারো নাই। নিজের পক্ষ হইতে এইরূপ অর্থ আবিষ্কার করার শক্তি আমার নাই, যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত অর্থ হইতে ভিন্ন এবং ইহার বিরোধী। আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কুরআন শরীফ গভীর মনোনিবেশের সহিত দেখিয়াছি, মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি, বার বার দেখিয়াছি এবং ইহার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি যে, কুরআন শরীফে যে পরিমাণে খোদার গুনাবলী ও কার্যাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ইহাতে সকল গুণের আধারের নাম আল্লাহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (সুরা ফাতেহা, আয়াত:২-৩) (অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়-অনুবাদক) অনরূপভাবে এই ধরনের আরও অনেক আয়াত আছে, যাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তিনি, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ তিনি, যিনি মোহাম্মদ (সা.)কে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব যেহেতু কুরআনী পরিভাষায় 'আল্লাহ' শব্দে ইহা অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ তিনি, যিনি মোহাম্মদ (সা.)কে প্রেরণ করিয়াছেন, সেহেতু ইহা জরুরী, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর আনিবে, তাহার এই ঈমান কেবল তখনই নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন স আঁ হযরত (সা.) এর উপর ঈমান আনিবে। খোদা তা'লা এই আয়াতে বলেন নাই যে, من اٰمن بالرحمٰن یامن اٰمن بالرحیم یامن اٰمن بالکریم (অর্থ: যে রহমানের উপর ঈমান আনে, বা যে রহীমের উপর ঈমান আনে, বা যে করীমের উপর ঈমান আনে-অনুবাদক)। বরং বলা হইয়াছে যে من اٰمن بالله অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান আনে। এবং আল্লাহ্‌র অর্থ ঐ সত্তা, যিনি সমষ্টিগত গুনের আধার। তাঁহার একটি আযীমুশ্বান গুণ এই যে, তিনি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা কেবল এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে পারি যে, সে আল্লাহর উপর কেবল তখনই ঈমান আনে যখন সে আঁ হযরত (সা.) -এর উপরও ঈমান আনে এবং কুরআন শরীফের উপরও ঈমান আনে। যদি কেহ বলে, তাহা হইলে ان الّذين اٰمنوا (অর্থ: যাহারা ঈমান আনিয়াছ-অনুবাদক) এর অর্থ কি? স্মরণ রাখিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে, যে সকল লোক কেবল খোদা তা'লার উপর ঈমান আনে তাহাদের ঈমান নির্ভরযোগ্য নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা খোদার রসুলের উপর ঈমান আনে, বা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ঐ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। এই কথা স্মরণ রাখা উচিত, কুরআন শরীফে স্ববিরোধীতা নাই। অতএব শত শত আয়াতে খোদা তা'লা যখন বলেন কেবল তওহীদ যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার নবীর উপর আনা নাজাতের জন্য জরুরী (কেবল এই অবস্থা ব্যতীত যে, কেহ এই নবী সম্পর্কে অনবহিত ছিল),

এরপর আটের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে ২০১৬

রসুল করীম (সা.) এক মহান ঐশী নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যা হযরত মসীহ মওউদ এর আগমণকালে প্রকাশ হওয়া নির্ধারিত ছিল। সেই নিদর্শনটি ছিল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ যা রমযান মাসের নির্ধারিত দিনগুলিতে হওয়ার ছিল। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দাবির প্রেক্ষাপটে এই আশমানী নিদর্শন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন মজীদ এবং রসুল করীম (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করতে দেখে আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হলেন সেই ইমাম মাহদী। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রসারের জন্য সত্যের প্রদীপ ছিলেন। তিনি পৃথিবীর মানুষকে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার জন্য আহ্বান করেছেন এবং নিজের জামাতকে সৃষ্টির সেবা ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, " মানব সম্প্রদায়ের প্রতি সদয় হওয়া এবং সহানুভুতি প্রদর্শন করা অনেক বড় ইবাদত এবং আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। "

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের বিশ্বাস মতে, ইসলাম এই শিক্ষাই দেয় যে, আল্লাহর অধিকার প্রদান আল্লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সৃষ্টির অধিকারকে আল্লাহর অধিকারের উপর প্রাধান্য পায়। সারসংক্ষেপ এই যে, ইসলামের শর্ত হল মানুষ কেবল তখনই মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে যখন সে অপরের ধর্ম ও বর্ণ না দেখে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ১৯০৮ সালে হযরত মসীহ (আ.)-এর তীরোধানের পর তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রসার করা। আর এটিই এর উদ্দেশ্য থাকবে। এখন আমি আপনাদের সামনে ইসলামে কতিপয় প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরব এবং ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলির অপনোদন করার চেষ্টা করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম মানুষকে যাবতীয় প্রকারের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থেকে ভালবাসা এবং পারস্পকরিক সম্মানের পতাকা তলে সমবেত হওয়ার শিক্ষা দেয়। ইসলাম সমাজের প্রত্যেক স্তরে মানুষের মধ্যে ন্যায় নীতি ও শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিকশিত করে। কুরআন করীমে সুরা আল মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করিবে ইহা তাক্বওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন। "

এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা সমস্ত মুসলমানদেরকে বিরোধী এবং শত্রু সহ সমস্ত মানুষের সাথে ন্যায় নীতি অবলম্বন করার আদেশ প্রদান করেছেন। অতএব ইসলাম কোন পরিস্থিতিতেই অত্যাচার বা অন্যায় করার অনুমতি প্রদান করে না। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রসুল করীম (সা.) পৃথিবীতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে এক উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নবী করীম (সা.) নিজ মাতৃভুমিতে বছরের পর বছর অত্যাচার নিপীড়নের কারণে হিজরত করে মদিনা চলে আসার পর যে ভাবে তিনি (সা.) খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের সাথে সম্মানপূর্ণ আচরণ করেছেন সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। মদীনার স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারা রসুলুল্লাহ (সা.) কেবল ধর্মীয় নেতা হিসেবেই গ্রহণ করেন নি বরং প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবেও নির্বাচন করেন। কিন্তু তা সত্বেও মদীনাতে বিরাট সংখ্যক ইহুদী এবং খৃষ্টান বসবাস করত। আঁ হযরত (সা.) প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সৌহার্দ্যতার বৈশ্বিক নীতির ভিত্তিতে ইহুদী এবং অন্যান্যা গোত্রের সাথে একটি শান্তি চুক্তি করেন। যে চুক্তি অনুসারে রসুল করীম (সা.) ইহুদী এবং অ-মুসলিমদের স্বাধীনতা বজায় রাখা হয়েছে। এর ফলে ঐ সকল অভিযোগের খণ্ডন হয় যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে বা ইহুদীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করার অনুমতি দেয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নবী করীম (সা.) -এর উত্তম চরিত্রের উদাহরণ আরও একটি স্থানে আমরা দেখতে পাই যখন নাজরান শহর থেকে আগত এক খৃষ্টান প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। যখন তিনি (সা.) জানতে পারেন যে, তারা ইবাদত করতে চান তখন তিনি (সা.) তাদেরকে ইবাদতের জন্য নিজের মসজিদেই ইবাদতের ব্যবস্থা করে বলেন এখানে তোমরা নিজেদের ধর্ম ও প্রথা অনুযায়ী ইবাদত করতে পার।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একটি অভিযোগ এটিও আরোপ করা হয়ে থাকে যে, ইসলাম জোরপূর্বক তরবারী বলে প্রসার লাভ করেছে। এই অভিযোগটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং সত্যতা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। নবী করীম (সা.) এবং তাঁর পরবর্তীতে খলীফা রাশেদীনদের যুগেও যে সকল যুদ্ধ হয়েছে সেগুলি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল এবং সেই যুদ্ধ গুলি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের উপর যখন যুদ্ধ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন মুসলমনারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলির এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের রক্ষা করেছে এবং তাদেরকে সম্মান করেছে। কিন্তু এতদসত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীতে নবী করীম (সা.)-এর অবমাননা করা হচ্ছে, এমনকি এখানে ডেনমার্কেও কয়েকবছর পূর্বে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হয় যার মাধ্যমে ইসলামের প্রবর্তক (সা.)-এর প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে একজন সাম্রাজ্যবাদী এবং যুদ্ধপ্রিয় প্রশাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বাস্তব হল নবী করীম (সা.)-এর চির সংকল্প ছিল শান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা যখন প্রথমবার মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন তখন এটি কেবল ইসলামের রক্ষার জন্য ছিল না বরং ধর্মের রক্ষার জন্য ছিল। এই কারণেই সূরা হজ্জের ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, "যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাগিদকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে; কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম; তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে যে, তাহা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহ হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খৃষ্টান, সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গীর্জা, ইহুদীদিগের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ-যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম।" আল্লাহ তা'লা এই আয়াত দুটিতে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, যদি মক্কাবাসীকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহত করা না যেত তবে না কোন গির্জা, কালিসা, মন্দির, মসজিদ অবশিষ্ট থাকত আর না কোন অন্য উপসনাগার সুরক্ষিত থাকত। কুরআন করীমের এই আয়াত অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিচ্ছে যে, যখন মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল তখন তা বিভিন্ন দেশ দখল করা বা অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় নি। বরং সমস্ত ধর্ম এবং মতবাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে এই অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। অতএব (নাউযু বিল্লাহ) রসুল করীম (সা.) ক্ষমতালোভী ছিলেন এবং নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একজন প্রকৃত মুসলমান ইসলাম বিরোধীদের এমন দাবীর কারণে যারপরনায় মর্মাহত হন। মহা নবী (সা.) কখনো ক্ষমতার বাসনা করেন নি। আর তিনি কখনো এমন যুদ্ধও চান নি যার দ্বারা জোরপূর্বক ইসলামের প্রসার ঘটাবেন। অতএব প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল, ইহুদী, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মের সুরক্ষা করা এবং মূল্য দেওয়া।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেবল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা সরাসরি নিজেরাই যুদ্ধে অংশ নেয়। তিনি (সা.) অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যুদ্ধচলাকালীন কোন নীরিহ মানুষের উপর আক্রমণ করবে না। মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদেরকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করবে না। কোন ধর্মীয় নেতা, বা পাদরী বা ধর্মীয় স্থলে আক্রমণ করবে না। তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, কাউকে ইসলাম গ্রহণ

এরপর আটের পাতায়...

জুমআর খুতবা

“রোযা যেভাবে তাক্বওয়া শেখার মাধ্যম অনুরূপভাবে এটি খোদার নৈকট্য লাভেরও একটি মাধ্যম।”

যতক্ষণ পর্যন্ত রমযান থেকে তাক্বওয়া শেখা, তাক্বওয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করা এবং খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা না করা হবে ততক্ষণ রমযান মাস দোয়া গৃহিত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে না। আর এটি যদি হয় তাহলে রমযানে খোদার সাথে সৃষ্ট সম্পর্ক শুধু রমযানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এক স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষণাবলী মানুষের জীবনে প্রকাশ পাবে।

দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী, নীতি এবং দর্শন সম্পর্কে জামাতের সদস্যদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি সহকারে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান।

মাননীয় রাজা গালিব আহমদ সাহেব (অব লাহোর) এবং মাননীয় মালিক মহম্মদ (অব জার্মানি)-র মৃত্যু বরণ। মরহুমীনদের সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১০ ই জুন, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৩ এহসান,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ۔ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৭)

অর্থ: আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), ‘নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।’

এই আয়াতটিকে রোযা রাখার নির্দেশ, রোযার শর্তাবলী ও রোযা সংক্রান্ত শিক্ষামালার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াত গুলোর মাঝে কেন্দ্রে স্থান দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রমযান এব দোয়া গৃহীত হওয়ার যে বিশেষ সম্পর্ক আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে বর্ণণা করেছেন যে, “রোযা যেভাবে তাক্বওয়া শেখার মাধ্যম অনুরূপভাবে এটি খোদার নৈকট্য লাভেরও একটি মাধ্যম।” (হাকায়েকুল ফুরকান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৮)

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত রমযান থেকে তাক্বওয়া শেখা, তাক্বওয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করা এবং খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা না করা হবে ততক্ষণ রমযান মাস দোয়া গৃহিত হওয়ার মাধ্যম হতে পারে না। আর এটি যদি হয় তাহলে রমযানে খোদার সাথে সৃষ্ট সম্পর্ক শুধু রমযানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এক স্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষণাবলী মানুষের জীবনে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এই কথাই বলেছেন যে, আমি নিকটে আছি। মহানবী (সা.) বলেছেন, এ মাসে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয় আর আল্লাহ্ তা'লা কাছে এসে যান, আল্লাহ্ তা'লা নিচের আকাশে নেমে আসেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সাওম)

কিন্তু কাদের কাছে আসেন? তাদের কাছে আসেন যারা খোদার নৈকট্য অনুভব করে বা করার ইচ্ছা রাখে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র তা'লার কথা মেনে চলে। فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ খোদার এই নির্দেশকে মেনে চলার চেষ্টা করে। খোদার নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জন করে আর সেগুলোর ওপর আমল এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। আর এ কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঈমান রাখে যে, খোদা তা'লা সর্ব শক্তির আধার। তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করে একনিষ্ঠভাবে আমি যদি তাঁর কাছে চাই তাহলে তিনি আমার দোয়া গ্রহণ করবেন।

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লা অবশ্যই তাঁর বান্দাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, আমি অতি নিকটে, আমি আমার বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করি, আর বিশেষ করে এই মাসে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। আমাকে ডাক, কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আমাকে ডাকার পূর্বে সেই সব শর্ত মেনে চলতে হবে অর্থাৎ আমার কথা শুন, গ্রহণ কর, আমার নির্দেশাবলী মেনে চল। আর আমার সকল শক্তি ও ক্ষমতার ওপর দৃঢ় এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। এই শর্তাবলী গুলি মেনে চলা আবশ্যক।

অতএব যারা বলে, আমরা দোয়া করি কিন্তু দোয়া গৃহিত হয় না, তারা কি আত্মবিশ্লেষণও করে? বা কখনও আত্মজিজ্ঞাসা করেছে কি যে, খোদার নির্দেশ কতটা মেনে চলেছে। যদি আমাদের কর্ম না থাকে, যদি আমাদের ঈমান প্রথাসর্বস্ব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই কথা বলা ভুল হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে ডেকেছি কিন্তু আমাদের দোয়া গৃহিত হয় নি।

খোদা তা'লা কী শর্ত নির্ধারণ করেছেন এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, “আল্লাহ্ তা'লা প্রথমতঃ বলেছেন, মানুষের মনে তাক্বওয়া এবং খোদাভীতির এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি হয় যার ফলে আমি তাদের কথা শুনতে এবং গ্রহণ করতে পারি।”

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা-২৬১)

যদি তাক্বওয়া থাকে, খোদার ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন এবং ডাকে সাড়া দেন। দ্বিতীয়তঃ, তারা যেন আমার ওপর ঈমান আনয়ন করে। কেমন ঈমান? এই কথার ওপর ঈমান আনতে হবে যে, খোদা আছেন এবং তিনি সকল শক্তি ও ক্ষমতার আধার। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে সকল ক্ষমতা রাখেন এর অভিজ্ঞতা মানুষের হোক বা না হোক অথবা সে সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হোক বা না হোক, ঈমান এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তাঁর মাঝে সকল শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ অদৃশ্য খোদায়, অদৃশ্য সত্তায় ঈমান থাকতে হবে। এটি যদি থাকে তাহলে খোদার পক্ষ থেকে এমন তত্ত্বজ্ঞানও লাভ হবে যার কল্যাণে খোদার পবিত্র সত্তা এবং তিনি যে সকল ক্ষমতা বা শক্তির আধার আর তিনি যে দোয়ার উত্তর দেন এই সম্পর্কেও মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জন হবে। প্রথমে মানুষের নিজের ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে

তারপর আল্লাহ্ তা'লা অগ্রসর হবেন এবং প্রমাণও পাওয়া যাবে। দোয়া গৃহিত হওয়ার শর্তাবলী, এর নীতি এবং দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষদভাবে আলোকপাত করেছেন।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করব যার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে রমযানে এটিকে খোদার নৈকট্য লাবের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের জ্ঞান এবং অন্তঃদৃষ্টি বৃদ্ধি করতে পারি আর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি এবং রমযানের কল্যাণে কল্যাণ মন্ডিত হতে পারি। কেউ কেউ মনে করে, আমরা যে দোয়াই করি তা অবশ্যই গৃহিত হতে হবে বা গৃহিত হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা আমি পূর্বেই করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহিত হওয়ার কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। সেই শর্ত পূরণ করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। দোয়া গৃহিত হওয়ার নীতি কি কি, এবং অনেক সময় যাবকীয় শর্ত পূর্ণ করে দোয়া করা সত্বেও প্রার্থনাকারীর সকল দোয়া সেই অনুপাতে গৃহিত হয় না যেভাবে তারা দোয়া করে থাকে- এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"দোয়ার নীতি হল দোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আশা-আকাঙ্খা এবং কামনা-বাসনার অধীনস্ত নন। দেখ সন্তানরা মায়েদের কাছে কত প্রিয় হয়ে থাকে? সে চাই তার সন্তানদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, কিন্তু সন্তান যদি জেদ ধরে থাকে আর কেঁদে কেঁদে যদি ধারালো ছুরি বা জলন্ত কয়লা চায় তাহলে মা সত্যিকার ভালোবাসা এবং প্রকৃত আন্তরিকতা সত্ত্বেও কখনো কি চাইবেন যে, তার সন্তান জলন্ত কয়লা নিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলুক বা ছুরির তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তে হাত মেরে হাত কেটে ফেলুক? কক্ষনো নয়। একই নীতির ভিত্তিতে দোয়া গৃহিত হওয়ার নীতিটিও বোঝা যায়। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দোয়ার কোন দিক যখন ক্ষতিকর হয়ে থাকে সেই দোয়া কোনভাবেই গৃহিত হয় না। এ কথা ভালোভাবে বোধগম্য হওয়া সম্ভব যে, আমাদের জ্ঞান সুনিশ্চিত এবং সঠিক নয়। অনেক কাজ আমরা বড় আনন্দের সাথে কল্যাণময় মনে করে করে থাকি আর ধরে নিয়ে থাকি যে, এটিই কল্যাণময় হবে কিন্তু পরিণতিতে তা একটি দুঃখ এবং সমস্যা হিসেবে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়। এক কথায় সকল কামনা বাসনা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, তা যথাযথ এবং সঠিক, কেননা ভুল করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। (ভুল ভ্রান্তি মানুষের হয়েই থাকে এটি তার প্রকৃতির অংশ।) তাই 'হওয়া উচিত এবং হয়'- এই মর্মে কিছু কামনা বাসনা বা চাওয়া পাওয়া ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ যদি এটিকে গ্রহণ করে নেন তাহলে তা খোদার রহমতের মর্যাদার স্পষ্ট পরিপন্থি কাজ হবে।"

মানুষ মনে করে যে, এটি হওয়া উচিত, এভাবে গৃহিত হওয়া উচিত, কিন্তু মানুষের নিজের বাসনাই অনেক সময় নিজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। খোদা যদি তা গ্রহণ করেন তাহলে খোদার রহমতের যে বৈশিষ্ট্য আছে এটি তার বিরুদ্ধে যাবে। খোদা দোয়াকারীর জন্য এবং বান্দার জন্য আশির্বাদ বা রহমত চান। মানুষ যেভাবে দোয়া করে তিনি যদি প্রত্যেকটি বাসনা সেভাবেই পূর্ণ করেন তাহলে তাঁর রহমত বা দয়া প্রদর্শনের যে মর্যাদা আছে এটি তার পরিপন্থী হবে। এটি নিশ্চিত কথা যে, খোদা বান্দার দোয়া শুনেন এবং গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দেন। কিন্তু সব দোয়ার ক্ষেত্রে নয় কেননা আবেগের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে না আর দোয়া করে কিন্তু খোদা তা'লা, যিনি সত্যিকার কল্যাণকামী, সত্যিকার পরিণামদর্শী, তিনি সেই সমস্ত ক্ষতিকর দিক এবং অশুভ পরিণামকে সামনে রেখে দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন যা দোয়া গৃহিত হলে দোয়াকারীর হতে পারে। (মানুষ পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে না, কিন্তু খোদা, যিনি বান্দার সত্যিকার মঙ্গল চান, তিনি পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। কোন দোয়া গৃহিত হলে সেই দোয়ার যে ক্ষতিকর দিকগুলোর কারণে তার যে ক্ষতি হতে পারে বা যে কুফল সামনে আসতে পারে সেটিকে দৃষ্টিতে রেখে দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, এই দোয়া প্রত্যাখ্যানের মাঝেই বান্দার কল্যাণ নিহিত।) এই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়া তার জন্য দোয়া গৃহিত হওয়ার নামান্তর। আল্লাহ্র সন্নিধানে এমন দোয়া যদি গৃহিত না হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে এটিই দোয়া গৃহিত হওয়া কেননা আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, এটি এর জন্য কল্যাণকর নয়। সুতরাং এমন দোয়া যার ফলে মানুষ দুর্ঘটনা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে তা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষতিকর দোয়ার ক্ষেত্রে তিনি দোয়া গ্রহণ করেন না। (যা কল্যাণকর তা আল্লাহ্ তা'লা অবিকল গ্রহণ করেন কিন্তু যাতে বান্দার ক্ষতির দিক থেকে তা প্রত্যাখ্যান করেন, গ্রহণ করেন না আর এটিই সেই দোয়ার ক্ষেত্রে গৃহিত হওয়াকে বঝায়।) তিনি বলেন, আমার প্রতি বারংবার এই ইলহাম হয়েছে যে, اُجِيبُ كُلَّ دُعَائِكَ অন্য ভাষায় এভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন দোয়া যা নিজে কল্যাণকর এবং উপকারি তা গ্রহণ করা হবে।

(মালফুযাকম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৭)

যা চাওয়ার দিক থেকে কল্যাণকর এবং উপকারীতা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু প্রত্যেক দোয়া গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওলী এবং নবীদেরও কিছু দোয়া গ্রহণ করেন আর কিছু দোয়া গ্রহণ করেন না। আর এই না করার কারণ হল তিনি জানেন যে, এটি কল্যাণকর হবে না বা এর ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে কেননা খোদা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, আর তিনিই ভালো জানেন।

পুনরায় দোয়ার জন্য নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপরও দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"এটি সত্য কথা যে, যে ব্যক্তি কর্ম এবং শ্রম বিমুখ সে দোয়া করে না। (দোয়ার সাথে কর্মও আবশ্যক) বরং সে আল্লাহ্কে পরীক্ষা করে। (অর্থাৎ আমল না করে আর শুধু দোয়া করে তাহলে এমন ব্যক্তি দোয়া নয় বরং আল্লাহ্র পরীক্ষা করছে।) তাই দোয়ার পূর্বে নিজের সকল শক্তিকে কাজে রূপায়িত করতে হবে আর এটিই দোয়ার অর্থ। প্রথমে নিজের বিশ্বাস এবং কর্মের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক কেননা আল্লাহ্র রীতি অনুসারে অবস্থার সংশোধন হয় উপকরণের ভিত্তিতে (সংশোধনের জন্য উপকরণ চাই।) তিনি এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। যারা বলে যে, দোয়া করা হলে আর উপকরণের প্রয়োজন কি? (যেহেতু দোয়া করা হয়েছে অতএব উপকরণের প্রয়োজন নেই।) তাদের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিত। যারা এমন কথা বলে তারা নির্বোধ, তাদের চিন্তা করা উচিত যে, দোয়া নিজেও তো একটি সুপ্ত উপকরণ।(দোয়াও তো কোন কাজ সম্পাদনের জন্য একটি গুপ্ত মাধ্যম হয়ে থাকে এবং সেই কাজটি করার জন্য একটি কারণ হয়ে থাকে।) যা অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করে দেয়। (দোয়া নিজেও প্রধানত একটি মাধ্যম এবং কাজ হওয়ার কারণ হয়। আর এই উপকরণ অর্থাৎ দোয়া গৃহিত হলে সেই কাজের জন্য অন্যান্য উপকরণও সৃষ্টি হয়। কোন মানুষের হয়তো ঋণ বা টাকা পয়সা বা কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আর আল্লাহ্ তা'লা কোনভাবে, কোন মাধ্যমে তার জন্য কোন উপকরণ সৃষ্টি করেন। আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো কোন কিছু বর্ষিত হয় না। কারও যদি টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় তাহলে তা আকাশ থেকে আসবে না বরং কোন মাধ্যম সৃষ্টি হবে আর সেটিই সেই উপকরণ যা দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেন।) তিনি বলেন, আর 'ইয়্যাকা নাসতাঈন'-এর পূর্বে 'ইয়্যাকা নাবুদু' দেওয়া হয়েছে যা একটি দোয়া সূচক বাক্য, এটি এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে। (প্রথমে 'ইয়্যাকা নাবুদু' বলা হয়েছে এরপর বলা হয়েছে, আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ আমরা দোয়া করি এবং একই সাথে সাহায্য প্রার্থনা করি। আর সাহায্যের দোয়ার কারণে উপকরণের প্রতিও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়।) অতএব আমরা খোদার রীতি এটিই দেখছি যে, তিনিই উপকরণ সৃষ্টি করেন। দেখ! পিপাসা নিবারণের জন্য পানি, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার সৃষ্টি করেন কিন্তু কোন না কোন মাধ্যমে এগুলো হয়ে থাকে। সুতরাং উপকরণের বিধান এভাবেই কাজ করছে। আর উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি হয় কেননা দু'টো নামই খোদা তা'লার, অর্থাৎ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (সূরা আল্-ফাতাহ্: ০৮) আযীয শব্দের অর্থ হল সব কাজ করা, (অর্থাৎ তিনি মহা পরাক্রমশালী, সমস্ত কাজ করার শক্তি এবং ক্ষমতা আছে। আর হাকীম শব্দের অর্থ হল প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে যথা স্থান এবং কাল পরিপ্রেক্ষিতে করা।) দেখ তিনি উদ্ভিদ এবং জড় বস্তুতে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। জামাল গোটাকে দেখ, তা দু-এক তোলা খেলেই দাস্ত বা পেট খারাপ হয়। অনুরূপভাবে 'সিকমোনিয়ার'ও একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কোন উপকরণ ছাড়াই দাস্ত বা পেট খারাপ করতে পারতেন বা পানি ছাড়া পিপাসা নিবারণ করতে পারতেন বা নিবারণ হওয়া সম্ভব ছিল কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে অবহিত করাও আবশ্যক ছিল কেননা প্রকৃতির বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয় ততই মানুষ খোদার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে নৈকট্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৪-১২৫)

আল্লাহ্ তা'লা যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এসবের গুণাবলী এবং বিশেষত্বের জ্ঞান সৃষ্টি করাও আল্লাহ্র জন্য আবশ্যক কেননা এসবই আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট। তিনি বলেন, এসবের জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান যত ব্যাপক

হতে থাকে ততই খোদার গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হয় এবং এই বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ হয়। আর এটিই একজন ধার্মিক ব্যক্তির কাজ। নাস্তিক নিজের জ্ঞানকেই সবকিছু মনে করে কিন্তু একজন মু'মিন জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে খোদার গুণাবলীর জ্ঞান অর্জন করে।

এরপর দোয়ার দর্শন এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

দেখ! একটি শিশু ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে দুধের জন্য চিৎকার করে আর তখনই সবেগে মাতৃস্তনে দুধ নেমে আসে অথচ বাচ্চা তখন দোয়ার নামও জানে না। কিন্তু এর কারণ কি যে, তার চিৎকার দুধকে আকর্ষণ করে। এটি এমন একটি বিষয় যার অভিজ্ঞতা মোটের ওপর সবার রয়েছে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, মায়েরা নিজেদের বক্ষে দুধ আছে বলে অনুভবও করেন না আর প্রায় সময় দুধ থাকেও না। কিন্তু বাচ্চার ব্যাকুল কান্না কানে আসতেই বক্ষে দুধ নেমে আসে। এমনটি প্রতীত হয় যেন বক্ষে দুধ নেমে আসা এবং আকর্ষণের সাথে বাচ্চার এই চিৎকারের একটি সম্পর্ক আছে। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, খোদার দরবারে আমাদের আহাজারি এবং চিৎকারও যদি এমন ব্যাকুল হয় তাহলে তা তাঁর ফযল এবং করুণা সাগরকে উদ্বেলিত করে এবং প্রবল আকর্ষণের সাথে টেনে নিয়ে আসে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৮)

মা সন্তানের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সেটিই হল দোয়ার দর্শন। এই দর্শনের প্রেক্ষিতেই মানুষের চাওয়ার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। আর এই বৈশিষ্ট্য অর্জিত হলে আল্লাহ তা'লা তাকে গ্রহণীয়তার দৃশ্যও দেখিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর গ্রহণ করা খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য। যে এটি বোঝে না এবং স্বীকার করে না সে মিথ্যাবাদী। শিশুর যে দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তা দোয়ার দর্শনকে খুব স্পষ্ট করে। রহমানিয়্যত এবং রহিমিয়্যত দু'টো পৃথক বিষয় নয়। যে একটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি সন্ধান করে সে তা পেতে পারে না। (রহিমিয়্যতের জন্য রহমানিয়্যতকে ছেড়ে দেবেন এটি সম্ভব নয়।) রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি হল আমাদের মাঝে রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর শক্তি সৃষ্টি করা। (আল্লাহ্‌র যে রহিমিয়্যত আছে অর্থাৎ তাঁর কাছে চেয়ে কিছু নেওয়ার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, রহমানিয়্যতই সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে।) যে এমনটি করে না সে এই নিয়ামতের অস্বীকারকারী। 'ইয়্যাকা না'বুদু' -র এটিই অর্থ যে, আমরা তোমার ইবাদত করি সেই বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে যা তুমি দান করেছ। (বাহ্যিক উপায় উপকরণের ভিত্তিতেই আমরা ইবাদত করি, আর এই উপকরণগুলোর একটি হল দোয়া আর দ্বিতীয় হল সেসব জিনিসকে কাজে নিয়োজিত করা যা আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।) লক্ষ্য করে দেখ, জিহ্বা, যা শিরা-উপশিরা এবং স্নায়ুর সমন্বয়ে গঠিত (এই জিহ্বার মধ্যে স্নায়ু ছাড়াও লালা রয়েছে) যদি এমনটি না হতো তাহলে আমরা কথা বলতে পারতাম না। (জিহ্বা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে মানুষের জন্য কথা বলা সম্ভবপর হয় না। জিহ্বার কোন পেশীতে টান পড়লে তা সেখানেই থেমে যায়।) অনুরূপভাবে দোয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জিহ্বা দিয়েছেন যা হৃদয়ের ধারণা প্রকাশে সহায়ক হয় (মনের কথা প্রকাশ করতে পারে, মানুষ কথা বলতে পারে।) আমরা যদি দোয়ার জন্য জিহ্বাকে কখনো কাজে না লাগাই তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। অনেক ব্যাধি এমন আছে যে, জিহ্বা যদি তাতে আক্রান্ত হয় তাহলে নিমিষেই জিহ্বার কর্মশক্তি লোপ পায় এবং মানুষ এক পর্যায়ে বোবা হয়ে যায়। অতএব এটি কত বড় রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কানের গঠনে যদি পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে কিছু শোনা সম্ভব হয় না। হৃদয়ের অবস্থাও একই। এতে বিনয়, ক্রন্দন আর চিন্তা ভাবনা ও প্রণিধানের যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন হৃদয় রোগাক্রান্ত হলে এর প্রায় সবকটি হারিয়ে যায়। উন্মাদদের দেখ, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিভাবে অকেজ হয়ে যায়। এসব খোদা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন করা কি আমাদের জন্য আবশ্যক নয়? খোদা তা'লা পরম অনুগ্রহ বশতঃ যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন এগুলোকে আমরা যদি অকেজো ফেলে রাখি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা এই সমস্ত নিয়ামতের অস্বীকারকারী বলে গণ্য হব। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজের শক্তি-বৃত্তিকে অকেজ ছেড়ে দিয়ে যদি দোয়া করি তাহলে সেই দোয়া কোন উপকারে আসতে পারে না। (খোদা তা'লা যেসব শক্তি দিয়েছেন, সামর্থ্য দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন, উপকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সবকে কাজে নিয়োজিত কর, এরপর দোয়া কর। এছাড়া দোয়া কোন কাজে আসে না।) কেননা খোদার প্রথম দান এবং উপকারকে যেখানে আমরা কাজে লাগাই নি সেখানে অন্যটি থেকে কিভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারব? (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১) এগুলোও আল্লাহ্ তা'লারই দান যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোকে কাজে লাগিয়ে দোয়া করলে তবেই সেটি কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মে দোয়া গৃহিত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"বস্তুত প্রকৃতির নিয়মেও আমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সকল যুগে আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এজন্যই তিনি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দোয়া শিখিয়েছেন। এটি খোদার ইচ্ছা এবং নিয়ম। কেউ এতে পরিবর্তন আনতে পারবে না। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ থেকেও এটি বুঝা যায় যে, আমাদের কর্মকে তুমি পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা দাও, আমাদের কর্মকে পরম মার্গে পৌঁছাও। এই শব্দগুলো সম্পর্কে প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যত এই আয়াতের মাধ্যমে দোয়ার নির্দেশ রয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, দোয়া কর,'সীরাতে মুস্তাকিম' বা সঠিক পথ যাচনা করার শিক্ষা এটি (অর্থাৎ সঠিক পথে চলার জন্য খোদার নিকট দোয়া কর।) কিন্তু এর পূর্বে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলছে যে, এর থেকে উপকৃত হও। সঠিক পথের বিভিন্ন গন্তব্য অতিক্রমের জন্য সঠিক অক্ষুণ্ন শক্তি ব্যবহার করে খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। (সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন সেগুলোকে কাজে নিয়োজিত কর এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও।) অতএব বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক, যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করে সে নিয়ামতের অস্বীকারকারী।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৮)

তিনি আরও বলেন, "অনেক ব্যাধি এমন আছে, (জিহ্বার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে যে) জিহ্বা যদি সেই সব রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে জিহ্বা বিকল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা আকুতি-মিনতি ও চিন্তা-ভাবনা এবং প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। সুতরাং স্মরণ রেখো, যদি এইসব শক্তি সামর্থ্যকে অব্যাহতি দিয়ে দোয়া করা হয় তাহলে তা আদৌ উপকারী হতে পারে না কেননা প্রথম দানকে যেখানে সে কাজে লাগায় নি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি থেকে সে কিভাবে লাভবান হতে পারে। তাই ' ইহদেনাস সিরাতাল মুস্তাকীম '-এর পূর্বে ' ইয়্যাকা না'বুদু' রাখা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, তোমার পূর্বে প্রদত্ত নিয়ামতরাজিকে আমরা অকেজো রেখে নষ্ট করি নি। স্মরণ রেখো রহমানিয়্যতের বৈশিষ্ট্য হল রহিমিয়্যত থেকে উপকৃত হওয়ার তিনি যোগ্য করেন, আল্লাহ্ তা'লা যে, اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা আল্-মু'মিন: ৬১) বলেছেন এটি শুধু শব্দ বা বুলিসর্বস্ব নয় বরং এটি মানুষের সম্মান বা মানব সম্মানের একটি দাবি। চাওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য আর বিশেষত যে এই চেষ্টা করে না যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ করুন, খোদা তা'লা যে দোয়া গ্রহণ করেন যে ব্যক্তি এর সন্ধানে থাকে না, এই অভিজ্ঞতা লাভ করার সন্ধানে যে থাকে না সে অত্যাচারী। দোয়া এক তৃপ্তিকর অবস্থার নাম। পরিতাপের বিষয় যে, আমি কিভাবে পৃথিবীকে এই তৃপ্তিদায়ক অনুভুতি এবং আনন্দ সম্পর্কে অবগত করব? এটিতো অনুভব করার বিষয়। সারকথা হল, দোয়ার আবশ্যকীয় উপকরণগুলোর মধ্যে প্রধানত যা আবশ্যকীয় তা হল নেককর্মশীল হওয়া এবং বিশ্বাস তৈরী করা, (সেই কর্ম বা সেই কাজ করা যা করার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন আর নিজের বিশ্বাস এবং ঈমানকে দৃঢ় করা) কেননা যে ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসের সংশোধন করে না এবং নেক কর্ম বা সৎকর্মের ভিত্তিতে কার্যসাধন করে না কিন্তু দোয়া করে এমন ব্যক্তি যেন আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করছে। 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম-এর দোয়ার উদ্দেশ্য হল আমাদের আমল এবং কর্মকে তুমি পরিপূর্ণতা দাও, উৎকর্ষতা দান কর। এরপর 'সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম' বলে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা সেই সঠিক পথের হিদায়াত চাই যা নিয়ামতপ্রাপ্ত শ্রেণীর পথ, (আমাদেরকে এমন লোকদের পথ দেখাও যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ) তিনি বলেন, অভিশপ্তদের পথ থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর,(যারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদের পথ অনুসরণ করা থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, আমাদের আমল বা কর্ম যেন সবসময় সঠিক থাকে, এমন কোন কর্ম যেন সম্পাদিত না হয় যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী।) অসৎ কর্মের পরিণামে যাদের ওপর খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছিল এবং যাদেরকে 'যাল্লীন' বলে এই দোয়া শিখিয়েছেন তাদের

থেকেও সুরক্ষিত রাখ কেননা, তোমার সাহায্য এবং সমর্থন ব্যতিরেকে আমরা পথহারা হব।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৯-২০০)

এমন যেন না হয় যে, তোমার রহমানিয়্যত থেকে আমরা লাভবান হওয়া থেকে বঞ্চিত হই আর এর ফলে রহিমিয়্যত থেকেও বঞ্চিত হই আর তোমার সাহায্য, তোমার দয়া এবং কৃপা থেকেও আমরা বঞ্চিত হই আর দিশেহারা হয়ে পড়ি। এখানে ' যাল্লীন' বলে আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

পুনরায় জগতপিপাসুদের এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে ক্রন্দন এবং আহাজারির ফলে কিছুই লাভ হয় না, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"অনেকের ধারণা হল আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি ও ক্রন্দনে কিছুই লাভ হয় না। এটি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। এই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর গুণাবলীর শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার বিশ্বাস থাকতো তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাতো না। যখন কোন ব্যক্তি খোদার দরবারে আসে আর সত্যিকার তওবার সাথে সে প্রত্যাবর্তন করে তখন আল্লাহ্ তা'লা সব সময় তার ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন। কেউ খুবই সত্য বলেছে, এটি ফারসী কবিতা রয়েছে,

আশেক কে শুদ কে ইয়ার বাহালশ্ নাযার না কারদ্,

এ্যা খাজা দারদ্ নিস্ত ও গার না তাবীব হাস্ত।

'সে কেমন প্রেমিক যার প্রতি প্রেমাস্পদ চেয়েই দেখেন না। হে বান্দা! হে মানুষ! ব্যাথা বা বেদনাই নেই, নতুবা চিকিৎসক তো রয়েছে।' তোমার মাঝে বা তোমার হৃদয়ে ব্যাথা নেই, চিকিৎসক তো আছেনই। নিজের মাঝে ব্যাথা এবং বেদনা সৃষ্টি কর, খোদা তা'লা তো দোয়া গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চান, তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর দরবারে আস। একমাত্র শর্ত হল নিজেদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন কর (এরপর فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي মেনে চল) আর সেই পবিত্র সত্যিকার পরিবর্তন যা মানুষকে আল্লাহ্র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করে দেখাও। আমি তোমাদের সত্য বলছি, আল্লাহ্র সত্তায় বিস্ময়কর শক্তি রয়েছে, তাঁর মাঝে অনন্ত ফযল এবং কল্যাণরাজি রয়েছে,কিন্তু তা দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন। (আল্লাহ্কে এমনভাবে ভালোবাস যেন তিনি দোয়া গ্রহণ করেন, সত্যিকার ভালোবাসা যদি থাকে তাহলে তিনি অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন) এবং সাহায্য ও সমর্থন দান করেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৩)

আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য মানুষের কেমন হওয়া উচিত, যার দোয়া খোদা শুনেন এবং স্বীয় শক্তির কুদরতও প্রদর্শন করেন, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"শর্ত হল আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকা চাই। আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা মানুষের হীন এবং ইতর জীবনকে ভস্মীভুত করে তাকে নতুন কলেবর বিশিষ্ট একজন স্বচ্ছ ও নির্মল মানুষে পরিণত করে। (তাকে পবিত্র করে তোলে) তখন সে এমন সব বিষয় দেখে যা পূর্বে দেখেনি, এমন সব কিছু শুনে যা পূর্বে শুনেনি। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা কৃপা এবং অনুগ্রহের যে আধ্যাত্মিক খাবার সৃষ্টি করেছেন তা থেকে সত্যিকার অর্থে লাভবান হওয়ার জন্য তিনি মানুষকে শক্তি এবং সামর্থ্যও দিয়েছেন। তাই এগুলোকে ব্যবহার করা এবং কাজে লাগানো উচিত। যদি শক্তি সামর্থ্য দিয়ে উপকরণ সৃষ্টি না করতেন তাহলে ত্রুটি থেকে যেতো। আর যদি এই উপকরণ থাকতো আর তা অর্জন করার শক্তি সামর্থ্য না থাকতো তাহলেই বা কি লাভ হতো। কিন্তু না, বিষয় এমন নয়, তিনি শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতা উভয়ই দিয়েছেন আর উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে একদিকে খাদ্যের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন তেমনি অপরদিকে চোখ, জিহ্বা এবং দাঁত আর পাকস্থলী দিয়েছেন আর যকৃত এবং অন্ত্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন, আর এইসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন খাদ্যকে।" (আর যকৃত, পাকস্থলী ও অন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র এইসব কিছু খাদ্য পরিপাকের জন্য আবশ্যক) যদি পেটে কিছু না যায় তাহলে হৃৎপিন্ডে রক্ত কোথা থেকে আসবে, খাবার পরিচ্ছন্ন হয়ে রক্তের অংশ কিভাবে হবে, এরপর আবর্জনা হয়ে কিভাবে বের হবে? অনুরূপভাবে সর্বপ্রথম যে কৃপা তিনি করেছেন তা হল, মহানবী (সা.)-কে ইসলামের মত উৎকৃষ্ট এবং পরিপূর্ণ ধর্মসহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে খাতামান নবীঈন বানিয়েছেন, কুরআন শরীফের মত পরিপূর্ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ দান করেছেন যার পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না, কোন নতুন নবী কোন নতুন শরীয়ত নিয়েও আসবে না। এরপর চিন্তা এবং প্রণিধানের যে শক্তি রয়েছে সেগুলোকে যদি কাজে না লাগাই, খোদার দিকে যদি অগ্রসর না হই তাহলে কত বড় আলস্য এবং ঔদাসীন্য এটি। একটু চিন্তা কর যে, আল্লাহ্ তা'লা এই প্রথম সূরাতেই কত বিস্তারিত ভাবে খোদার কৃপাধন্য হওয়ার রীতি শিখিয়েছেন।"

(সুতরাং এই হল লাভবান হওয়ার রীতি যা মহানবী (সা.)-এর মত নবী আমাদেরকে দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সুন্নত অনুসরণ করতে পারি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের মত গ্রন্থ দিয়েছেন যেন আমরা এই কুরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে পারি। তিনি বলেন, এই প্রথম সূরাতেই অর্থাৎ সূরা ফাতেহায় কত বিস্তারিতভাবে খোদার কৃপাধন্য হওয়ার দোয়া শিখিয়েছেন।) এই সূরায়, যার নাম হল খাতামাল কুতুব এবং উম্মুল কুতুব, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে কিভাবে অর্জন করা যায় তাও বলেছেন। 'ইয়্যাকা না'বুদু' হল মানবপ্রকৃতির মূল দাবি এবং মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর এটিকে 'ইয়্যাকা নাসতাঈন' -এর পূর্বে রেখে বলেছেন যে, প্রথমে আবশ্যক হল যতটা সম্ভব মানুষের শক্তি সামর্থ্য এবং বোধ বুদ্ধি আছে সেটি কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা এবং সংগ্রাম কর আর খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, এরপর খোদার কাছে এর পূর্ণতা, সম্পূর্ণতা এবং ফলপ্রদ হওয়ার জন্য দোয়া করা।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩-৩৫৪)

খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যম কি, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"এটি সত্য কথা যে, خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (সূরা আন্-নিসা: ২৯) মানুষ দুর্বল সৃষ্টি, সে খোদার কৃপা এবং বদান্যতা ছাড়া কিছুই করে উঠতে পারে না। খোদার কৃপা না থাকলে কিছুই করা সম্ভব হয় না। তার অস্তিত্ব, তার লালন-পালন, তার স্থায়ীত্বের পুরো উপকরণ নির্ভর করে খোদার কৃপার ওপর। দুর্ভাগা সে, যে নিজের বোধ-বুদ্ধি বা নিজের সম্পদ নিয়ে গর্ববোধ করে, কেননা এই সব কিছুই খোদার দান। সে কোত্থেকে এনেছে এসব। দোয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হল, মানুষের নিজের দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতাকে দৃষ্টিতে রাখা। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সে যতই ভাববে এবং চিন্তা ও প্রণিধান করবে ততই নিজেকে খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষি পাবে। এভাবে দোয়ার জন্য এক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস তার মাঝে সৃষ্টি হবে। (অনেকে বলে দোয়ার জন্য আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় না, তাদের মূলত নিজেদের দূর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত। এরপর ভালোবাসার দাবি পূরণের চেষ্টা করলে এক জোশ, এক আবেগ, এক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হবে।) মানুষ যখন সমস্যা কবলিত হয়, দুঃখ এবং অসচ্ছলতার মুখোমুখি হয় তখন সে প্রচণ্ড চিৎকার করে এবং ডাকে আর অন্যের কাছে সাহায্য চায়, অনুরূপভাবে যদি সে নিজের দুর্বলতা এবং পদস্খলনের আশঙ্কা সম্পর্কে চিন্তা করে আর প্রতিটি মূহুর্ত যদি নিজেকে খোদার সাহায্যের মুখাপেক্ষি মনে করে তাহলে তার আত্মা আকুল আবেগ এবং ব্যাকুলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সিজদাবনত হবে এবং কাঁদবে, আহাজারি করবে আর 'ইয়া রাব্ব, ইয়া রাব্ব' অর্থাৎ হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু! বলে তাঁকে ডাকবে। গভীর মনোযোগসহকারে কুরআনের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত কর তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, প্রথম সূরাতেই আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শিখিয়েছেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ- তিনি বলেন, দোয়া তখনই পূর্ণাঙ্গীন হতে পারে যদি তা কল্যাণকর হয় এবং স্থান-কাল ভেদে করা হয়। সকল ক্ষতিকর বিষয় থেকে এটি মানুষকে রক্ষা করে। (সেটিই দোয়া যা সকল প্রকার কল্যাণে সমৃদ্ধ, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং যা মানুষের জন্য উপকারী। মানুষের জন্য যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে তা থেকে তাকে রক্ষা করার সেই সব বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে ও সেই সব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।) সুতরাং এই দোয়ায় ('ইহ্দিনাস সিরাতাল মুসতাকীম' থেকে 'ওয়ালায যাল্লীন' পর্যন্ত) যত কল্যাণকর দিক থাকতে পারে সম্ভাব্য সকল কল্যাণের দোয়া এতে করা হয়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক যা মানুষকে ধ্বংস করে তা থেকে মুক্তি এবং পরিত্রাণের দোয়ায় এটি সমৃদ্ধ। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১১-৪১২)

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে, সবচেয়ে বড় যেসব দোয়া এই সূরায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা জাগতিক কোন দোয়া নয় বরং ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত দোয়া। তাই নিজেদের ধর্মের হিফাযত এবং সুরক্ষার

জন্য দোয়াকে অগ্রগণ্য করা উচিত। দোয়া করলেই খোদার নৈকট্যের দার উন্মোচিত হয় আর এর ফলে বাকী সব দোয়া নিজ থেকেই গৃহীত হয়ে যায়।

প্রকৃত দোয়া হল ধর্মের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করা, আর এটিই খোদার নৈকট্য অর্জন এবং দোয়া গৃহিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ অর্থাৎ আমি তওবাকারীর তওবা গ্রহণ করি। আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি সেই অঙ্গিকারকে বৈধ আখ্যা দেয় যা মানুষকে সত্যিকার তওবাকারী করে থাকে। যদি এ ধরণের অঙ্গিকার না হত তাহলে তওবা গৃহীত হওয়া এক দূরুহ ব্যাপার ছিল। আন্তরিকভাবে যা স্বীকার করার ফলে আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর সকল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকেন, যা তিনি তওবাকারীদের সাথে করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার হৃদয়ে এক আলোর প্রতিফলন ঘটতে থাকে। কেবল তখনই মানুষ অঙ্গীকার করে যে, আমি সকল পাপ এড়িয়ে চলব আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০০)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্য ও দোয়া গৃহীত হওয়ার যে রীতি উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মাধ্যম হল নামায। নামাযের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল দোয়া, আর দোয়া করা আল্লাহ্‌র একান্ত প্রকৃতি সম্মত। সচরাচর আমরা দেখে থাকি একটি শিশু যখন ক্রন্দন করে, উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করে মা কতটা ব্যাকুল হয়ে তাকে দুধ পান করায়। প্রভুত্ব এবং দাসত্বের মাঝে এমনই একটি সম্পর্ক যা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষ যখন খোদা তা'লার দরবারে সিজদাবনত হয়ে পরম বিনয়ের সাথে ও আকুতি মিনতির সাথে তাঁর সামনে নিজের পুরো চিত্র তুলে ধরে আর নিজের চাওয়া পাওয়া তাঁর কাছেই পেশ করে তখন প্রভুর বদান্যতা অবশ্যই প্রকাশিত হয় আর এমন ব্যক্তির প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। খোদার কৃপা এবং বদান্যতার দুগ্ধ এক ক্রন্দনকে চায়, এক আহাজারির দাবি রাখে। (তাই খোদার ফযল এবং বদান্যতার দুগ্ধ যদি পেতে হয় তাহলে তাঁর দরবারে বিনয় এবং আকুতি-মিনতির সাথে ক্রন্দন করতে হবে।) তিনি বলেন, এর জন্য ক্রন্দনশীল দৃষ্টি বা চোখের প্রয়োজন।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫২)

সুতরাং রমযানে যেখানে অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আল্লাহ্‌র ফযলে মসজিদের প্রতিও নিবদ্ধ, আর বাজামাত নামাযের প্রতি মনোযোগ থাকে। তাই সেই সাথে নফলের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এরপর সেই সব দোয়া যা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং খোদার নৈকট্য লাভের জন্য হয়ে থাকে সেগুলোকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। প্রথম দোয়া এগুলো হওয়া উচিত আর পরে জাগতিক দোয়া আসা উচিত। ফলে জাগতিক উদ্দেশ্যে আমাদের যেসমস্ত দোয়া করা হবে এমন দোয়া আল্লাহ্ তা'লা নিজেই গ্রহণ করবেন।

এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া উপস্থাপন করব যা এই দিনগুলোতে আমাদের বিশেষ ভাবে করা উচিত, যেন খোদার নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে তিনি দোয়া করেন যে,

"হে বিশ্ব প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই, তুমি অত্যন্ত দয়ালু এবং বদান্যশীল, আমার প্রতি তোমার অশেষ কৃপা রয়েছে, আমার পাপ ক্ষমা কর, কোথাও আমি ধ্বংস না হয়ে যাই, আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সৃষ্টি কর যেন আমি জীবন লাভ করতে পারি, আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখো আর আমাকে এমন কাজের তৌফিক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তোমার মহাসম্মানিত চেহারার দোহাই তুমি আমাকে ক্রোধ থেকে রক্ষা কর, করুণা কর, কৃপা কর, ইহকাল এবং পরকালের বিপদাবলী থেকে আমাকে রক্ষা কর কেননা সকল কৃপা এবং বদান্যতা আর অনুগ্রহ তোমারই হাতে। আমীন, সুম্মা আমীন।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৫)

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এ রমযান আমাদের সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং স্থায়ীভাবে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুক যারা ঈমানে দৃঢ় হয়, যারা তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি কর্ণপাত করে এবং সেই অনুসারে আমল করে আর নিজেদের প্রতিটি কাজের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় ও অগ্রগণ্য করে। আমাদের প্রতিটি কাজ যেন খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে হয়, আমাদের বিশ্বাস যেন পূর্বের চেয়ে বেশি দৃঢ় হয়, আমাদের মাঝে খোদার সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি হোক, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইহকাল এবং পরকালের সমস্যাবলী থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াবো। দু 'জন ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা হবে। তাদের একজন হলেন শ্রদ্ধেয় রাজা গালেব আহমদ সাহেব। তিনি জামাতের একজন প্রবীন খাদেম ছিলেন, উর্দূর প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা বিশারদ ছিলেন। সরকারী চাকুরী করেছেন, পাঞ্জাব টেক্সট বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন। ২০১৬ সনের ৪ঠা জুন লাহোরে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ১৯২৮ সনে গুজরাত শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত রাজা আলী মোহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। ১৯০৫ সনে তিনি বয়আত করে জামাতভুক্ত হন। তার পিতা কাদিয়ানে নাযের মাল এবং নাযেরে আলা হিসাবে খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। রাজা গালেব সাহেবের নানা ছিলেন মালেক বরকত আলী সাহেব। হযরত মালেক আব্দুর রহমান খালেদ (যিনি খালেদে আহমদীয়াত ছিলেন) তিনি তার মামা হন। তিনি লাহোর থেকে মেট্রিক পাশ করেন, কাদিয়ানে উচ্চ মাধ্যমিক আর লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে সাইকলোজিতে মাষ্টার ডিগ্রি করেন এবং ১ম স্থান অধিকার করেন। কবি, বুদ্ধিজীবি এবং শিক্ষাবিদ আর সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে বিশেষ জ্ঞানী এবং সাহিত্যিক শ্রেণীর মাঝে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আল ফজলের পাশাপাশি দেশীয় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাময়িকিতে তার রচনাবলী এবং কবিতা ছাপতে থাকে। চাকুরীর সূচনা হয় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর মাধ্যমে। এরপর ১৯৬২ সনে পাঞ্জাব শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন, এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জেনারেল সেক্রেটারী এবং কন্ট্রোলার বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট, সেক্রেটারী বোর্ড অফ এডুকেশন, ইন্টারমিডিয়েট বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব টেক্সট বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় উপদেষ্টা হিসাবেও উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। জামাতী সেবার ইতিহাসও অনেক দীর্ঘ। লাহোরে জেনারেল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী তালিম এবং আরো বেশ কিছু পদে খিদমত করেছেন। ১৯৭৪ সালে জামাতে আহমদীয়ার মুখপাত্র হিসাবে বেশ কয়েকবার প্রেস কনফারেন্স করেছেন, প্রেস রিলিজ এবং বিবৃতি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন কেননা তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ফজলে ওমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ ছিলেন ১৯৭৪ থেকে ৮৫ সাল পর্যন্ত, এছাড়া নাসের ফাউন্ডেশনের নায়েব সদর বা ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। খুবই সরল এবং শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাগফিরাত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার নিজের কোন সন্তান ছিল না। এক পালিতা কন্যা আছে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য দিন।

দ্বিতীয় জানাযা মুকাররম মালেক মোহাম্মদ আহমদ সাহেবের, তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন, ২০১৬ সনের ৬ই মে ইন্তেকাল করেন। এই উভয় জানাযা গত শুক্রবারে পড়ানোর কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে পড়ানো সম্ভব হয়নি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত শেখ ফযল আহমদ সাহেব বাটালভী (রা.)-এর বড় পুত্র ছিলেন। খিলাফত ব্যবস্থার সাথে আনুগত্য, আবেগ এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। সন্তানদেরও এই বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হওয়ার নসীহত করতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার অনুগত, ভদ্র, মিশুক, বিনয়ী, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহমর্মি, স্নেহশীল, সহানুভূতিশীল এবং পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। সারা জীবন বেশ কিছু মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন, অনেক ছেলেমেয়ের পড়াশুনার দায়িত্ব বহন করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্বগুলো তিনি খুব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাহরীকে জাদীদের দপ্তর আউয়ালের পাঁচ হাজার মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য তাহরীকে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রেও উদার মনোভাবের পরিচয় দিতেন। রাবওয়ায় একটি ভূমিখণ্ডও তিনি জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে তিনি ধর্মের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রথমে তিনি বাইরে চাকুরী বা কাজ করতেন, এরপর জীবন উৎসর্গ করেন। রাবওয়ায় নির্মাণ বিভাগে ১৯৪৯ থেকে ৫৫ সাল পর্যন্ত খিদমত করেছেন, ৫৫ থেকে ৬৮ সাল পর্যন্ত ওকালত তবশীর বিভাগে অধীক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৯ থেকে ৮২ পর্যন্ত নায়েব অফিসার আমানত হিসাবে খিদমত করার

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 21st July, 2016 Issue No. 20

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

সুযোগ হয়েছে। ৮২ থেকে ৮৬ পর্যন্ত নায়েব উকিলুল মাল সানী হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ৮৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ এর জুন পর্যন্ত পুনরায় নিযুক্ত হয়ে জামাতের খিদমত করা অব্যাহত রাখেন। ৮৬ থেকে ৮৯ পর্যন্ত নায়েব উকিল তা'মিল ও তানফিয হিসেবে কাজ করেন। প্রায় ৪৭ বছর জামাতের খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। এরপর তিনি নিজ সন্তানের কাছে জার্মানী এসে যান। খুবই ইবাদতগুযার ও কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর ব্যাপক অধ্যায়ন করতেন। আল্লাহ্‌র ফযলে মুসী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে ২ পুত্র এবং ৪ কন্যা রেখে গেছেন। আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ লায়েক তাহের সাহেব তার ছোট ভাই, এখানে আল ফযল ইন্টারন্যাশনালেও ওয়াকেফে যিন্দেগী কর্মী মুবাল্লিগ মাহমুদ সাহেব তার ছোট সন্তান। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন এবং তাকে কৃপাধন্য করুন, তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিষ্ঠা ওআন্তরিকতার সাথে জামাত এবং খিলাফতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

ওয়াকফীনে নও -দের প্রাথমিকতা

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ওয়াকফীনে নও-এর ক্লাসে উপদেশ করতে গিয়ে বলেন:

" ওয়াকফে নও-এর উপাধি নিয়ে সফ্‌ট ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সাইন্স-এ যাওয়ার পরিবর্তে জামিয়াতে ভর্তি হওয়াকে প্রাথমিকতা দেওয়া উচিত। এর পর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোন পেশায় যাওয়ার কথা চিন্তু করুন।"

(রোয নামা আল-ফযল, ১০ জুলাই-২০১৩)

ওয়াকফীনে নও হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর এই নির্দেশে সাড়া দিয়ে এ বছর জামিয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন।

একের পাতার পর....

তদবস্থায় কোন একটি আয়াতে ইহার বিপরীত এই কথা বলা যে, কেবল তওহীদ দ্বারাই নাজাত পাওয়া যাইতে পারে-ইহা কীরূপে সম্ভব? তাহারা বলে, কুরআন শরীফ ও আঁ হযরত (সা.) এর উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই আয়াতে তওহীদের উল্লেখও নাই। যদি তওহীদই লক্ষ্য হইত তবে এইরূপ বলা উচিত ছিল 'আমানা বিত তাওহীদ' (অথ: যে তওহীদের উপর ঈমান আনে-অনুবাদক) কিন্তু আয়াতের শব্দগুলি হইল (অর্থ: যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে -অনুবাদক) অতএব কথাটি আমাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ শব্দটি কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার উপর চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। আমাদের সততার দাবী হওয়া উচিত যখন আমরা কুরআন শরীফ হইতেই এই কথা জানিয়াছি যে, 'আল্লাহ' শব্দটিতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আল্লাহ তিনি , যিনি কুরআন প্রেরণ করিয়াছেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আমাদের ঐ অর্থটিই গ্রহন করা উচিত যাহা কোরআন শরীফ বর্ণনা করিয়াছে। নিজের পক্ষ হইতে কোন অর্থ করা উচিত নহে।

টীকা: যদি এই আয়াতের এই অর্থ হয় যে, কেবলমাত্র তওহীদ যথেষ্ট তবে নিম্ন আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, শেরেক ও এই জাতীয় সকল পাপ তওবা ব্যতীত ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ আয়াতটি এই -

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

(সূরা আল যুমার, আয়াত-৫৪) অর্থ ঃ তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন-অনুবাদক)। অথচ ব্যাপারটি কখনো এইরূপ নহে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা-১৪৪-১৪৭)

দুয়ের পাতার পর....

করার জন্য কোনক্রমেই বাধ্য করবে না। এটিই কুরআনের শিক্ষা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই শিক্ষাবলী বিদ্যমান থাকা সত্বেও বর্তমানে যে যুদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলিতে আমরা ক্রমধারায় এমন ঘটনাবলী দেখতে পাই যেখানে এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ, বোমা বর্ষণ করে নীরিহ, নিরস্ত্র নাগরিক ও মহিলা, শিশু ও বয়স্কদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এমন মুসলমান যারা এমন বর্বরতাপূর্ণ আচরণ করে তারা কেবল নিজেদের ধর্মকেই বদনাম করছে। কঠোর থেকে কঠোরতম ভাষায় তাদের নিন্দা করা উচিত। কিন্তু ইসলামে এমন অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ উপস্থিত হওয়া অনিবার্য ছিল। কেননা, মহানবী (সা.) এই অবস্থার ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়বে। এটি এমন যুগে হওয়া নির্ধারিত ছিল যখন আল্লাহ তা'লা মসীহ মওউদ (আ.)কে আর্বিভুত করা নির্ধারিত ছিল যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুশীলন করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যাইহোক, এটি সত্য কথা যে, বর্তমানে মুসলমান দেশগুলি বিশ্বস্ততা, সততা এবং ন্যায় নীতির মত প্রকৃত ইসলামী নীতির অনুশীলন করছে না। যখন এবং যেখানেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করা হয়েছে সেখানে প্রত্যেকেই সেই নীতিমালার সৌন্দর্য্য এবং উপযোগীতার প্রশংসা করেছে। যেমন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে, যিনি মহা নবী (সা.) -এর দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন, ইসলাম সিরিয়া পর্যন্ত প্রসার লাভ করে এবং সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শাসন ব্যবস্থায় খৃষ্টান নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য একটি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রোম সাম্রাজ্য তার দখল নিলে মুসলমান প্রশাসন এই শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়। কেননা, এখন মুসলমান প্রশাসকগণে জন্য এই সকল খৃষ্টানদের সুরক্ষা ও তাদের অধিকার প্রদান করা সম্ভব ছিল না। মুসলমান প্রশাসকদের কাছে সেখান থেকে ফিরে আসা ছাড়া উপান্তর ছিল না। মুসলমানদেরকে ফিরে যেতে দেখে সেখানকার সেই সমস্ত অ-মুসলিমরাও বেদনাক্রান্ত ছিল, যারা মুসলমানদের অধীনে ছিল। তারা অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে মুসলমানদেরকে ফিরে আসার আবেদন করছিল। এবং তাদের জন্য কাতর দোয়া করছিল। তারা নির্দিধায় এই ইচ্ছা প্রকাশ করছিল যে, মুসলমানরা যেন ফিরে এসে তাদের উপর পুণরায় শাসন করে এবং রোমান প্রশাসনের অন্যায়-অবিচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। এর পর পুণরায় যখন মুসলমানগণ সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করে তখন অ-মুসলিমরাই প্রথম উল্লাস করছিল। কেননা, তারা জানত যে পুণরায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। (ক্রমশঃ)

হাদীসে নবুবী (সাঃ)-এর আলোকে

অশিষ্টদের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর উদারতা প্রদর্শন

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সংস্কৃতিহীনদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন যারা মূলত শিষ্টাচারের অভাবে গর্হিত আচরণ করে বসত। একবার সদ্যই ইসলাম গ্রহণ করা এক আরব বেদুঈন মহানবী (সাঃ) এর সংসর্গে মসজিদে বসেছিল। সহসা সেই বেদুঈন উঠে দাঁড়ায় এবং দ্রুত গতিতে মসজিদের এক কোনের দিকে দৌড়ে গিয়ে সেখানে মুত্রত্যাগ করা আরম্ভ করে। কয়েকজন সাহাবা উঠে গিয়ে তাকে এই গর্হিত কর্ম হতে বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু রসুলে করীম (সাঃ) তাদেরকে নিবৃত করলেন। এবং বোঝালেন যে তাকে এই কাজ থেকে বাধা দিলে সে অসুবিধায় পড়বে এমনকি সে আঘাত পেতে পারে। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাকে ছেড়ে দিতে বললেন এবং পরে সেই স্থানটি পরিস্কার করার নির্দেশ দিলেন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir